সকল পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষ (২০২৩)-র প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-১০, সংখ্যা: ১ জানুয়ারী, ২০২৩ AANANDA AANGAN মাঘ ১৪২৯

অমরশিল্পী রাফায়েল

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে একজন শিল্পী পৃথিবীর সর্বকালের সেরা শিল্পীদের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছে, এ কথা কি ভাবা যায়? অথচ এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালিতে।

এই অমর শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ইতালির পাহাড়ঘেরা ছোট্ট শহর আরবিনোতে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বাবা জিওভানি সান্টিও ছিলেন পেশায় শিল্পী। আরবিনোর ডিউক তাঁর প্যালেসের ইতালীয়ও ফ্লেমিশ ছবিগুলোর দেখাশোনার কাজে তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন।

রাফায়েলের ছোটোবেলা সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। তবে যেটুকু জানা যায়, সেটাও খুব সুখের নয়। বেচারির কপালটা ছিল খুবই মন্দ। মাত্র আট বছর বয়সেই মা মারা গেলেন। আর এগারো বছর বয়সে বাবা। তবে শিশু রাফায়েল নিজেদের বাড়ির দেওয়ালে 'ম্যাডোনা এবং যিশু'র ছবি এঁকেছিলেন, সেটি দেখে তার বাবা বুঝেছিলেন ছেলের ছবি আঁকার ক্ষমতা আছে। তাই মৃত্যুর আগেই ইভানজেলসটা মিলেটা নামে এক স্থানীয় শিল্পীকে ছেলের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর মাত্র বারো বছর বয়সেই রাফায়েল চলে এলেন তখনকার বিখ্যাত শিল্পী পিয়েট্রো পেরুজিনোর সংস্পর্শে। পিয়েট্রো পেরুজিনো ছিলেন তখনকার ইতালির একজন সফল শিল্পী। পেরুজিয়া ও ফ্লোরেন্সে ছিল তাঁর শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়ার দুটি স্কুল। রাফায়েল পেরুজিনোর বাড়িতেই থাকতেন কি না, সেটা জানা যায় না, তবে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত পেরুজিনোর শিক্ষিত সহকারী হিসাবে যে কাজ করেছিলেন, সে খবর পাওয়া যায়।

কুড়ি বছর বয়সেই রাফায়েল স্বাধীনভাবে ছবি আঁকা শুরু করলেন। ইতালির এই সময়কার ছবি আঁকার ধারা কেমন ছিল— একথা বলতে গেলে এককথায় বলতে হয় 'গল্প-বলা ছবি'। এ যুগের ছবি দর্শককে একটা কাহিনি বা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিত। সে কাহিনি ধর্মের বা পুরাণের হতে পারে। শিল্পী কাহিনির একটা বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তকে বেছে নিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর ছবিতে। লিওনার্দো,

ম্যাডোনা ও যিশু

মাইকেলএঞ্জেলো এবং রাফায়েল— তিনজনেই এই ধারার শিল্পী ছিলেন। খ্রিস্টধর্মের কাহিনি নিয়ে রাফায়েল এই সময় যে ছবি আঁকলেন, তার নাম 'দ্য ম্যারেজ অব দ্য ভার্জিন'। এরপরই ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পী চলে এলেন ফ্লোরেন্সে জীবিকার সন্ধানে।

রাফায়েল যখন ফ্লোরেন্সে এসে পৌঁছালেন, তখন ইতালির শিল্পকলার এক মাহেন্দ্রক্ষণ। বিরাট শক্তিধর দুই সেরা শিল্পী তখন ফ্লোরেন্সে কাজ করছেন। একজন তাঁর থেকে একত্রিশ বছরের বড়ো লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যিনি ইতিমধ্যেই 'লাস্ট সাপার' আর 'মোনালিসা' এঁকে জগদ্‌বিখ্যাত হয়ে গেছেন।। অন্যজন তাঁর থেকে আট বছরের বড়ো মাইকেল এঞ্জেলো, যিনি ইতিমধ্যেই 'ডেভিড' মূর্তি তৈরি করে ফ্লোরেন্সে হইচই ফেলে দিয়েছেন। রোমে তৈরি 'পিয়েটা'র কথা সকলের মুখে মুখে ফিরছে। আবার দু'জনে একসঙ্গে তখন দুটো ছবি আঁকছেন নতুন কাউন্সিল চেম্বারের দেওয়ালে। অন্য তরুণ শিল্পীরা হয়তো এসব দেখে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেন। রাফায়েল কিন্তু নিরুৎসাহী হলেন না। শিল্পী বুঝলেন তাঁর বিরাট অসুবিধা আছে এখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার। কিন্তু রাফায়েলের বিরাট সম্পদ ছিল তাঁর মিষ্টি ব্যবহার, যা সহজেই যারা তাঁকে দিয়ে ছবি করাত তাদের আকৃষ্ট করত। রাফায়েল মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে লাগলেন। পুরানো শিল্পীদের নরম রং, সহজ পদ্ধতিতে তাঁর আঁকার মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাফায়েল তখনও প্রায়ই পেরুজিয়াতে যেতেন। যদিও তখন পেরুজিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন তাঁকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফ্লোরেন্সে তেমন নামডাক হয় না। আর হবে কী করে! সবাই তো লিওনার্দো আর মাইকেলঞ্জোলোর ছবি-মূর্তির আলোচনাতেই বিভোর হতে থাকে। রাফায়েলেরে আঁকা 'ম্যাডোনা ও যিশু' ছবির প্রতিলিপি লোকে ঘরে রাখত নিজেদের পূজার জন্য, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তেমন কোনও বড় কাজের দায়িত্ব আর এই তরুণ শিল্পীদের দেওয়া হল না। বুদ্ধিমান শিল্পী বুঝলেন, ওঁরা দুজন থাকতে এখানে তেমন কোনও সুবিধা হবে না। তাই চার বছর বাদে ১৫০৮ সালে কাজের সন্ধানে চলে গেলেন রোমে।

এই সময় রোমেও মাইকেলএঞ্জেলো কাজ করছেন। সিস্টিন চ্যাপেলের কাজ সদ্য শুরু হয়েছে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস এই দ্বিতীয় তরুণ শিল্পীকে পেয়ে তাঁকেও কাজে লাগিয়ে দিলেন। ভ্যাটিক্যানের বিভিন্ন ঘরের দেওয়াল ও সিলিং-এ ফ্রেস্কো করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হল। রাফায়েল তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। পরের বছর তাঁকে মাইনে করা সরকারি শিল্পী হিসাবে নিযুক্ত করা হল।

তখনকার দিনে এটা খুবই গর্বের ব্যাপার ছিল যে মাইকেলএঞ্জেলো সিস্টিন চ্যাপেলে কাজ করছেন, সেখানে দ্বিতীয় তরুণ শিল্পী রাফায়েলও কাজ করছেন। আর কোনও শিল্পীর ভাগ্যে এমন দুর্লভ সম্মান জোটেনি। শিল্পী ভাসারির লেখা থেকে জানা যায়, মাইকেলএঞ্জেলো যখন সিস্টিন চ্যাপেলের কাজে মগ্ন হয়ে আছেন, তখন চুপিচুপি রাফায়েলকে সেই আঁকা দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ওই আঁকা দেখে তিনি নাকি নিজের আঁকার ধাঁচ পালটে দিয়েছিলেন।

এই তরুণ শিল্পী লেখাপড়া ভালোই জানতেন। ইতালীয় ভাষা শেখার আগেই ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। রোমে গিয়েছিলেন অন্তত প্রতিকৃতি আঁকার কাজ পাবেন— এই আশায়, কিন্তু অতি অল্প সময়েই সে আমলের 'গল্প বলা ছবি' আঁকার কাজে পটু হয়ে উঠলেন। সে আমলে 'এথেন্সের শিক্ষালয়' নামে এই তরুণ শিল্পী একটা ছবি এঁকে খুব নাম করেছিলেন। এই ছবিতে একটা মজার কাণ্ড করেছিলেন শিল্পী।

এরপর আগামী সংখ্যায়
সৌজন্যে : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা

উদ্বোধন হচ্ছে ৩০ জানুয়ারী। এবারের থিম কান্ট্রি স্পেন। শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড। সেখানেই ঘোষণা করা হয় ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারী শুরু হবে বইমেলা। চলবে ২০২৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবারই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন বইমেলা প্রাঙ্গনে পরবর্তী বইমেলা হবে। সেই মতোই এবার সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণে বসবে বইমেলার আসর।

গিল্ডের তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর বইমেলায় ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। তাই উৎসাহিত হয়ে নতুন প্রকাশকেরা এগিয়ে আসছেন। এবার বইমেলার লোগো ডিজাইন করবেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য থিম কান্ট্রি হচ্ছে স্পেন। ৫৭০টি স্টল বসেছিল গতবছর। এ বছর স্টলের সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছে বইমেলা কর্তৃপক্ষ। ২৪০টি লিটল ম্যাগাজিন স্টল হয়েছিল গতবার। এবারও সেই সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন স্টল থাকবে। এবার কলকাতা বইমেলার সঙ্গেই চলবে নবম কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল।

সাধারণত শীতের মরশুমেই প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। মাঝে ২০২১ সালে করোনার কারণে বইমেলা স্থগিত রাখতে হয়। গতবছর বইমেলা নিয়ে নানা আশঙ্কার মেঘ দেখা গিয়েছিল। যদিও পরে কিছুটা দিন পিছিয়ে একগুচ্ছ বিধিনিষেধের ঘেরাটোপেই বইমেলার আয়োজন করে গিল্ড। ঠিক হয়, মাস্ক ছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রতিটি বুকস্টল থাকবে খোলামেলা। সামাজিক দূরত্ববিধি, স্যানিটাইজেশনের যথাযথ ব্যবস্থা, ভ্যাকসিনেশনের উপর জোর দিয়ে গতবারের বইমেলা হলেও করোনার কাঁটা কাটিয়ে এবার 'মুক্তমনা' বইয়ের উৎসব।

দেশ বিদেশ থেকে বইপ্রেমীরা হাজির হন এই মেলায়। কলকাতার বুকে বইমেলা কার্যত উৎসব। যে উৎসবে শুধু কলকাতা বা শহরতলীর মানুষই নন, বিভিন্ন জেলা থেকে ভিড় আসে উপচে পড়া। দেশ, বিদেশ থেকেও বইপ্রেমীরা আসেন। কোটি কোটি টাকার বইয়ের বিকিকিনি হয় এই মেলায়।

দ্বিতীয় বর্ষে সুন্দরবন বইমেলা

সুন্দরবন বইমেলা কমিটির উদ্যোগে প্রত্যন্ত গোসাবার দ্বীপভূমি ছোট মোল্লাখালি মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উ:মা:) প্রাঙ্গণে বিগত ২৫ মার্চ ২০২২, প্রথম সুন্দরবন বইমেলা উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়।

ছোট মোল্লাখালি মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠে ২৫ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত চারদিন এই বইমেলা সফলতা লাভ করে।

প্রথম সুন্দরবন বইমেলায় কলকাতা থেকে আগত ২৫টি বই-এর স্টল এবং ১০টি লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল বসেছিল। নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত এই দ্বীপাঞ্চলের সকল মানুষের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই বইমেলা। ছাত্র ছাত্রী শিক্ষানুরাগী মানুষের বই পড়া ও বইকেনার আগ্রহ প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের মনে আশাতিরিক্ত আনন্দ সঞ্চার করেছে।

সুন্দরবন বইমেলা সুন্দরবাসীর জীবনে নিয়ে এল এক নতুন মাত্রা, নিয়ে এল নতুন স্বাদ। সচেতন বইপ্রেমী মানুষ বই পড়েছে, বই কিনেছে। তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে, আনন্দের সঙ্গে লালন করেছে, মনে মনে গর্ব অনুভব করেছে। সুন্দরবন বইমেলা প্রথম বর্ষ তাই সুন্দরবনবাসীর কাছে গর্বের বইমেলা। সুন্দরবন বইমেলা ২০২৩ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করবে। বইমেলা কমিটির সম্পাদক ড: সঞ্জিত জোতদার মহাশয়ের কাছ থেকে জানা গেল দ্বিতীয় বর্ষের বইমেলা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এর উদ্বোধন করবেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা সহ বিশিষ্ট গুণিজন। দ্বিতীয় বর্ষের বইমেলা চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৬দিন।

প্রথম বর্ষের বইমেলার আয়োজনে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও আশাকরি দ্বিতীয় বর্ষের সুন্দরবন বইমেলা আরও সফলতা লাভ করবে ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস

ইংরেজি নববর্ষ। পুরাতনকে পেছনে ফেলে সূচনা হবে নতুন প্রভাতের, নতুন বছরের। নানান আয়োজনে পালিত হলেও, আজও অনেকেরই অজানা 'নিউ ইয়ার' তথা ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস। কিভাবেই বা প্রচলন হল ইংরেজি মাসগুলো? চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক নিউ ইয়ারের খুঁটিনাটি।

বিশ্বব্যাপী পালিত উৎসবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিসেবে মনে করা হয় বর্ষবরণ উৎসবকে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে মেসোপটেমীয় সভ্যতায় (যে সভ্যতা গড়ে উঠেছল সে সময়কার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে) প্রথম বর্ষবরণ উৎসব পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে ইরাকের প্রাচীন নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। এই মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার আবার ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা ও ক্যালডীয় সভ্যতা। এদের মধ্যে বর্ষবরণ উৎসব পালন করা শুরু হয় ব্যবিলনীয় সভ্যতায়। সে সময় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালন করা হতো বর্ষবরণ উৎসব। তবে তা এখনকার মতো জানুয়ারির ১ তারিখে পালন করা হতো না বরং তা পালিত হতো বসন্তের প্রথম দিনে। কেননা, শীতের রুক্ষতা ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতি আবার নতুন করে সাজাতে শুরু করে বসন্তে। গাছে গাছে নতুন পাতা, বাহারি রঙের ফুল আর পাখিদের কল-কাকলিতে প্রাণ ফিরে পায় প্রকৃতি।

প্রকৃতির এই নতুন করে জেগে ওঠাকেই নতুন বছরের শুরু হিসেবে পালন করতো ব্যাবিলনীয়ানরা। অবশ্য তখন বছর গণনা করা হতো চাঁদের উপর নির্ভর করে। যেদিন বসন্তের প্রথম চাঁদ উঠতো, শুরু হতো নতুন বছর আর বর্ষবরণ উৎসব। চলতো টানা ১১ দিন। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পর জাঁকজমকভাবে বর্ষবরণ উৎসব পালন করতো রোমানরাও। তবে তাদের ছিল নিজস্ব ক্যালেন্ডার। যদিও সে ক্যালেন্ডারও রোমানরা তৈরী করেছিল চাঁদ দেখেই। আর সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাদের নববর্ষ ছিলো মার্চের প্রথম দিন। প্রথম দিকে তাদের ক্যালেন্ডারে মাস ছিল দশটি। ছিল না জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাস। পরবর্তীতে সম্রাট নুমা পন্টিলিয়াস জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারীকে ক্যালেন্ডারে যোগ করেন। মাস থাকলেও রোমানদের ক্যালেন্ডারে ছিল না কোন তারিখ। চাঁদের বিভিন্ন অবস্থা দিয়ে মাসের বিভিন্ন সময়কে চিহ্নিত করতো রোমানরা। চাঁদ ওঠার সময়কে বলা হতো ক্যালেন্ডস, পুরো চাঁদকে তারা বলতো ইডেস, আর চাঁদের মাঝামাঝি অবস্থাকে বলা হতো নুনেস। পরবর্তী সম্রাট জুলিয়াস সিজার এই ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন ঘটান। তিনি ক্যালেন্ডস, ইডেস, নুনেসের পরিবর্তে যোগ করেন দিন-তারিখ। চন্দ্রমাসের হিসেবে সে সময় বছরের মোট দিন দাঁড়ায় ৩৫৫। এভাবে বছর হিসাবের ফলে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকে রোমের চাষীরা. সমস্যার সমাধানের জন্যে হোঞ্চাস হেডাস ফেব্রুয়ারী মাসের পর অতিরিক্ত আরও একটা মাস যুক্ত করেছিলেন ক্যালেন্ডারে। সমস্যা কমার বদলে আরো জটিল আকার ধারণ করেছিল সে সময়। পরবর্তীতে জুলিয়াস সিজার চন্দ্র হিসাবের বদলে সৌর মাসের ব্যবহার প্রত্যাবর্তন করেন. ফলে ৩৫৫ দিন থেকে বছর হলে গেলো ৩৬৫দিনের। (তবে অনেকের মতে, তিনি সৌর হিসেবের, ৩৬৫ দিনের নয়, বরং ৪৪৫ দিনের ক্যালেন্ডার বানিয়েছিলেন! যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে)। এতকিছু পরও সমস্যা ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে।

সেই সমস্যার সমাধান করেন অ্যালোসিয়াস লিলিয়াস নামের একজন ডাক্তার তিনি তৈরি করেছিলেন নতুন আরেকটি ক্যালেন্ডার। মাত্র ৪০০ বছরের কিছু আগে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যাটিকানের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে বাতিল ঘোষণা করে প্রচলন করেন এই ক্যালেন্ডারটির। যা বর্তমানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসেবেই পরিচিত। বর্তমানে যে সকল দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে সিভিল ক্যালেন্ডার হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই পহেলা জানুয়ারী তারিখেই ইংরেজি নববর্ষ পালন করে থাকে। ইতিহাস মতে, ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্কটল্যান্ড, ১৭৫২ সাল থেকে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ কলোনিগুলো নববর্ষের রীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। ১৭০০ সাল হতে রাশিয়া এই রীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। এই হলো ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস।

ছবি আঁকো, ছবি পাঠাও

প্রিয় শিশু ও কিশোর বন্ধুরা,

প্রকৃতি আমাদের চারিদিকের পরিবেশকে সুন্দর শিল্পকলার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিতে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এই সৃষ্ট শিল্পকলাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরাও শিল্পকলার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারি। এসো রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলি এই প্রকৃতিকে। তাই আর দেরি না করে তোমাদের আঁকা শিল্পকলা / ছবি পাঠিয়ে দাও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে।

মানুষের সন্ধানে বিবেকানন্দ

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার

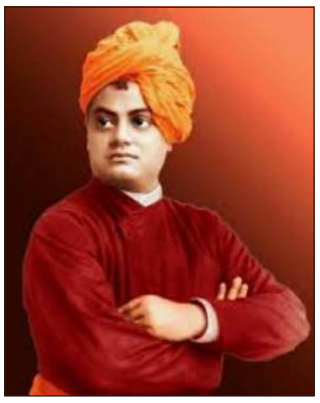

মানুষের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নতিতে কাজ করার অভীপ্সায় স্বামী বিবেকানন্দ হাজার বার জন্মগ্রহণে রাজি। এর জন্য নরকে যেতেও তিনি প্রস্তুত। শত শত বুদ্ধের কারুণ্য-নিষিক্ত হৃদয়বান মানুষই ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত। অজ্ঞ, কাতর, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে, তাদের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তাঁর ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মচিন্তার সবটাই জুড়ে আছে মানুষের কথা। তাঁর কাজ, চিঠি, প্রবন্ধ, বক্তৃতা নিজের হাতে গড়ে তোলা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রেও সেই মানুষের কল্যাণ ও উত্থানের প্রসঙ্গ এবং প্রাধান্য। গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেন, 'জীবে জীবে, বিশেষ মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থান'। 'তাঁর' অর্থাৎ মানুষ যাকে বলে দেবতা। যোগীর ধারণায় পরমপুরুষ- ভগবান-ঈশ্বর। বৈদান্তিক অনুভবে তিনি পরমব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'পাকা আমি'।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, দেবতা আকাশ থেকে নামেন না বা মাটি ফুঁড়েও ওঠেন না। বিবেকানন্দ চান জীবন্ত মানুষের পুজো। শিষ্যবর্গ এবং সতীর্থদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, 'মানুষের জন্য কাজ (যা পুজোরই শামিল) করে করে তোরা শেষ হয়ে যা, এটাই আমার আশীর্বাদ।' বিষয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রই নামান্তর।

আমরা সবাই আত্মপরতায় বাঁচতে চাই। পরার্থে জীবন উৎসর্গের বিষয়টি যেন থেকে যায় বাক্যবন্ধনীতে। এই আত্মপরতা থেকেই দেশ ও জাতির প্রতি আসে অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞা-অবহেলার কারণেই বিচ্ছিন্নতাবোধের মাথা চাড়া দেওয়া, জাতীয় সংহতির বিপন্নতা, জাতীয়তাবাদ-জাতীয়তাবোধের অবমাননা। মহাসমাধির আগে ঢাকা নগরীতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয়েক বছর ভুললে কোন ক্ষতি নেই। তাঁরা এখন ঘুমোচ্ছেন।' সর্বস্তরের মানুষের মনে স্বদেশ ও মাতৃভূমিকে বিবেকানন্দ সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন. তাই নিজে নগ্ন পায়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। দরিদ্রজনের পর্ণকুটিরে যে পদধূলি নিয়ে গিয়েছেন তিনি, সেই পদধূলি নিয়েই পৌঁছেছেন রাজার রাজপ্রাসাদে। ভাঙ্গির দেওয়া হুঁকোর সঙ্গে রাজার দেওয়া দামি চুরুটের কোনও ভেদ রাখেননি। প্রকৃত ভারতবর্ষ ঠিক কোথায়, তার অন্বেষণই ছিল এর মূলে। কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে তিন দিন তিন রাত অনাহারে, ধ্যানস্তব্ধতায় ভারতবর্ষের মানুষের উত্থানের উপায় খুঁজে ফিরেছেন। পাশ্চাত্যে যাত্রা তো তারই ফল। দেশ থেকে দেশান্তরে, অবশেষে আন্তর্জাতিকতায়। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নিজস্ব কোনও দেশ থাকার কথা নয়, সব দেশই তো তাঁর দেশ। তিনি বিশ্বনাগরিক। সকল মানুষের এই 'আইডেন্টিটি'র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট তিনি। তাই তিনি আন্তর্জাতিক একটি সংগঠন, আন্তর্জাতিক বিধান এবং আন্তর্জাতিক সংহতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন এবং তার বাস্তবায়ন চান। আসলে দেশ-মহাদেশের সীমা অতিক্রম করেই তো মানুষ হয়ে ওঠে বিশ্বনাগরিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিগ অব নেশনস (১৯১৯), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (১৯৪৫) গঠিত হয়, যা বিবেকানন্দের অভীপ্সিত। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। ছোট-বড় সব দেশ, সব মানুষ সেখানে সমান অধিকার পায়নি। বিশ্বের তাবৎ মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ সংস্থাপিত হয়েছিল বলেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে দ্বিতল বাসগৃহের বারান্দায় মধ্যরাতে বসে ফিজির কাছে অগ্ন্যুৎপাতে বহু মানুষে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট ফট করেচেন প্রকাশ্যে খবর জানার আগেই। সত্যি হল 'বুকের মাঝে' 'বিশ্বলোক'-এর সাড়া পাওয়া।

ধর্ম নিয়ে আজ পৃথবী সন্ত্রস্ত। মৌলবাদীদের আস্ফালন সর্বত্র। মানুষ বিপন্ন। বিবেকানন্দ মন ও মুখের সত্যতায় স্পষ্টতই জানান 'ধর্ম মানুষের বন্ধু'। তা কোনও শর্তাধীন নয়। বিনিময়যোগ্য স্বার্থের আদানপ্রদানে সঙ্কুচিতও নয়। ধর্ম বিবর্তনের পথেই এগোয়। ধর্ম সমাজের দায়বহন করে। নিরন্ন মানুষের জন্য অন্ন, অসুস্থ প্রপীড়িতের জন্য ত্রাণ-সেবা, অনাথ-বিধবার অশ্রুমোচনের দায়িত্ব ধর্মকেই নিতে হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন এই কাজই করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

আর্ট গ্যালারি

সুচরিতা চক্রবর্তী

একটা তৈল চিত্র থেকে বার বার খসে পড়ছি,
আঙুল ধরো প্রিয়জন।
আমার স্বেদ নষ্ট করে দিতে চায় চিত্রের চরিত্র-
প্রেক্ষাগৃহে বাহবা করতালির আড়ালে
আমার স্খলন চোখে পড়ে না কারো,
খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে একটা আঙুল চাই।
হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গেলাম ছবির বুকে
আমার রক্তে ছবির রঙ কিঞ্চিৎ বদলে গেলেও
অর্থ বদলে যায়নি।
আঙুল, সে কি কেবল এঁকে যায় মিথ্যে যত ছবি!

বিষণ্ণতা

আশিষ হাজরা

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে বিষন্নতার ছায়া
এক অদ্ভুত অন্ধকার গলি পথে এনেছে আমারে,
আলোকবিন্দু খুঁজতে গিয়ে তোমার কপালের টিপটাই ফিরে আসে মনে
ধূধূ প্রান্তর ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না
সাপের লকলকে জিভ আমাকে মৃত্যুর বিন শোনাতে চায়
শ্বাসরোধকারী দূষণে জড়ানো এক বিষন্নতা
আমার ঘুম থেকে প্রেম,
প্রেম থেকে তোমার,
তোমার কাছ থেকে আমাকে আলোকবর্ষ দূরে ঠেলে দিলো।

আষাঢ় এসে

সুশীল মণ্ডল

ব্যস্ত দিনে খড়কুটোর মত উড়তে থাকি
পাহাড়ী রোদ ঝরনার পথে নেমে আসে
মাটিতে।
তোমার আমার সম্পর্কের সাঁকোটা শক্ত
পোক্ত হতে
এমন দেরি কেন বুঝতে পারি না।

আষাঢ় এসে জানলায় টোকা মারে
দুপুর গড়িয়ে গেলে গীতবিতানে মুখ
ডোবায়
পাশের বাড়ির শ্যামলা বউটা
বিস্তর বাতাসে সে গান ছড়িয়ে যায়
বৃক্ষে বৃক্ষে এবং যমুনার জলে।।

অনেকদিন হয়ে গেল
অপরূপ অপরাজিতা আমার দিকে তাকায় না
ঋতু বদলের খেলায় সে আপন মনে হাসে
আমি বুঝতে পারি আমাদের সম্পর্কের
কোন সকাল নেই
কোন দুপুর নেই।

সাগর সঙ্গমে একদিন

শ্রীবাস মণ্ডল

সেদিন সাগর দেখলাম গঙ্গার সঙ্গম।
সাগর তীর্থ বিশ্বাসীর বারাণসী- মহাতীর্থ;
কারো বিশ্বাস এখানে ইহজীবনের মায়া কাটিয়ে নির্দ্বিধায় স্বর্গে পাড়ি দেওয়া যায়;
ধূয়ে মুছে ফেলা যায় যত পাপ অপরাধ।
দেখলাম প্রভাতী কাঁচা রোদের প্লাবন অকাতরে প্রাণশক্তি দিচ্ছে পূণ্যার্থীকে।
দীক্ষা দিচ্ছে নব উদ্যমে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।
পড়ন্ত বেলায় পশ্চিম দিগন্তের সূর্যের তেরছা আলো
তৈরি করছে মানুষের দীর্ঘ ছায়া-মায়ালোক।
সাধারণ জনতার কাছে এটি তার জীবন ধারণের জন্য রোজগারের ক্ষেত্র;
বিশ্বাস তার পুঁজি।
সৌন্দর্য সন্ধানীর কাছে এ বেলাভূমি নয়নাভিরাম।
কুয়াশা ভরা অক্ষম রৌদ্র যেন নুয়ে পড়ছে পৃথিবীর পিঠে।
চিকচিক করছে বালুকা ভূমি।
দৃষ্টির ভিতর-বাহিরে জলরাশি আর জলরাশি।
সার ভাটায় ছোট ছোট দুর্বল ঢেউ আছড়ে পড়ছে পূণ্যার্থীর পায়ে।
এক একটি ঢেউ বয়ে আনছে অনাবিল আনন্দের আবেশ।
আবছায়ায় ভেসে উঠছে সাংখ্য যোগের প্রাণ পুরুষ, মহামুনি কপিলের ছবি,
রাজা সগরের ষাট হাজার সন্তান,
মহাতপস্যী ভগীরথ আর পতিতপাবনী গঙ্গা।
আত্মিক আর আধ্যাত্মিক যোগ বড্ড ফেকাশে হয়ে গেছে।
বাস্তবটা? সে তো দ্রুত বদলে যাচ্ছে।
জীবন এখানে জল রং মাখছে।
চকচকে বাটি পেতে বসেছে আকাঙ্ক্ষু ভিখারীর দল।
গঙ্গা মাইয়ার দৌলতে তাদের উপার্জন।

ঝড়ের সুন্দরবন

ভবশেখর মণ্ডল

বছর বছর সুন্দরবনে আয়লা, ইয়াস, আম্ফান
সাইক্লোন ঝড়ে বিধ্বস্ত ভিটে জমি বাঁধ ও গ্রাম।
এপ্রিল থেকে মে মাসে নিম্নচাপের ঝড়বৃষ্টি
বাঁধ ভেঙে লোনা জলে নষ্ট সব ফসল সৃষ্টি।
জোয়ার ভাটা খেলছে গাঁয় লবণ জরা ভরা মাঠ
বর্ষার চাষ ভরসা হারা দুঃখে চাষির মাথায় হাত।
আশা নিয়ে বীজতলায় ডোবার মিঠে নোনতা জল
বৃষ্টি এলে লবণ ধুইয়ে ফেরে মাটির শক্তি বল।
আবার হতাশ হড়কা বান আকাশ বন্যায় সব শেষ
সদ্য রোওয়া ধানের গোছা পচেই নষ্ট ভাটি দেশ।
আশা হারা ভিন রাজ্যে খাটতে গেছে কাজের লোক
আমন শেষ কর্ম নেই অচল সংসার বাইরে ঝোঁক।
ফসল নেই মাছও মরে পচে মাঠের সব্জি শাক
গোরু, ছাগল পায়না জল শূণ্য পাখি শালিক কাক।
কোন গাঁয়ে অল্প ধান পাশের দ্বীপে শালুক ও মাছ
ঘূর্ণিঝড়ে উজাড় গাঁ আমড়া, আম, শিরিষ গাছ।
সেচের খাল নোনতা মিঠে গাঁয়ের মানুষ পেতে জাল
ভাদ্র মাস মাছের ঝোল, হাঁড়িতে ফোটে রেশন চাল।
কাস্তে শান দেয় না চাষি মাঘ মাসে চাষ বোরো ধান
বৈশাখেতে ফসল পেলেই নবান্নেরি জয়গান।

দীপশিখা মন্ডল, চিত্র শিল্পী আর্ট স্কুল

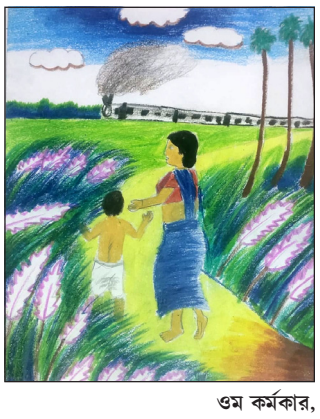

ওম কর্মকার, মৌটুসী এ স্কুল অব ড্রয়িং অ্যান্ড কালচার

ফরাসি সাহিত্যিক দোমিনিক ল্যাপিয়ের প্রয়াত

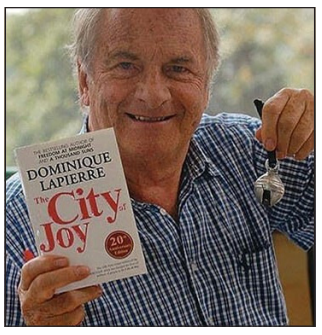

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'সিটি অফ জয়' (City of Joy) গ্রন্থের লেখক দোমিনিক ল্যাপিয়ের (Dominique Lapierre)। গত ৪ ডিসেম্বর ২০২২ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ৯১ বছরের ফরাসি সাহিত্যিক। জন্মসূত্রে এই লেখক ফরাসি ছিলেন কিন্তু ভারতের প্রতি আলাদা একটা অনুভব ছিল তাঁর।

কলকাতা শহরের রিকশা চালকের জীবনসংগ্রাম নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'সিটি অফ জয়'। এই উপন্যাস নিয়ে পরে একটি সিনেমাও তৈরি হয়। এই উপন্যাস লেখার পরেই সকলের কাছে পরিচিতি পান ফরাসি সাহিত্যিক দোমিনিক ল্যাপিয়ের।

সারা জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য। একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, বই বিক্রি বাবদ পাওয়া সব টাকা দিয়ে চব্বিশ বছরে তিনি শতাধিক রোগীর জীবন বাঁচাতে পেরেছিলেন। এর জন্য তাঁর পাঠকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য জীবনকে স্বীকৃতি জানাতে ২০০৮ সালে ল্যাপিয়ের (Dominique Lapierre)কে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার

রোশনাই

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আত্মজনের সমারোহে ঘিরে থাকা সময়
কখনো পুড়ে যেতে থাকে নীরবে,
বাঁশগাছের ফুলের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত
একাকিত্বকে খুঁজতে থাকে হন্যে হয়ে।
প্রতিটি দিনযাপনের সাথে রচিত হয়
নিজস্ব যন্ত্রণার পাণ্ডুলিপি।
এক এক করে যখন নিভে যেতে থাকে দেউটি
আগুনও তখন একা হয়ে পড়ে-
আমার অন্ধচোখের চাউনির অনুভূতিতে
এক অন্য আলোর রোশনাই।

প্রয়াত শিল্পী সনৎ কর

৮ জানুয়ারি ২০২৩, রবিবার ভোরে শান্তিনিকেতনে নিজ বাড়িতে প্রয়াত হলেন শিল্পী সনৎ কর। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

জন্ম ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে লেখাপড়া। তারপর বহু জায়গায় পড়িয়েছেন তিনি। তাঁর প্রথাগত কর্মজীবন শেষ হয় শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে। সেখানকার গ্রাফিক্স বিভাগের প্রিন্সিপাল ছিলেন শিল্পী। ১৯৯৫ সালে অবসর নেন সেখান থেকে। তত দিনে শিল্পীর ভাবনার ছোঁয়ায় শান্তিনিকেতনে শিল্প-শিক্ষায় এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বদল।

শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও কাজ থামেনি। শিল্পী নিত্যনতুন ভাবনার রসদ জুগিয়ে গিয়েছেন শেষসময় পর্যন্ত। ভারতীয় ছাপাই ছবির জগতে সনৎ কর এক পুরোধা শিল্পী। ভারতের গ্রাফিক প্রিন্টিংয়ের কাজে নানা গুরুত্বপূর্ণ বদল এসেছে তাঁর হাত ধরেই। 'সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্ট'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকেই। শান্তিনিকেতনের অনাবিল প্রকৃতির মাঝে দীর্ঘ সময়ের জীবনযাপন ও সেই সঙ্গে সক্রিয় অধ্যাপনার নিয়মানুবর্তিতা তাঁর কাজের রং ও রেখায় ফুটে উঠেছিল। স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সীমিত, সংক্ষিপ্ত রেখার বিন্যাসে জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিস্ময় ও বিশ্বাসকে শিল্পী তাঁর মাধ্যমগত করণকৌশলের দক্ষতায় অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর অর্ধশতাব্দীর দীর্ঘ শিল্পচর্চা ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের বিরল সম্পদ। শিল্পীর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিল্পজগতে। তাঁর সময়কালে অন্য ঘরানার গ্রাফিক্স প্রিন্টিং শিল্পকর্ম শিল্প জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শীতের পরশ

পিঙ্কু দাস

শীতের পরশ লেগেছে বঙ্গতীরে
গঙ্গা নদীর ধারে,
ফুলে ফুলে রাঙিয়ে ভুবন
হাসিছে আকাশ পারে।

শীতের পরশ লেগেছে গায়ে
দক্ষিণা বাতাস বয়িছে হেথায়
নদী কিনারায় বটের ছায়ায়
বাউলেরা গান শুনিয়ে যায়।

ডাহুক ডাহুকী করিছে ডাকাডাকি
ধবল বলাকা যাযাবর বেশে
সারিসারি চলে গোরুগাড়ি
হিম পড়ে কচি ঘাসে।

মহুয়া আর শালবনে নিজ মনে
রাখাল বাজায় বাঁশি,
রাঙাপথ ধরে আসে পথচারী
মাঠে ধান কাটে চাষী।

শীতের সকালে আসে
খেজুর গাছে রশের হাঁড়ি।
শরিষে ক্ষেতের শেষ সীমানায়
ওই দেখা যায় হলুদ লালচে রঙের শাড়ি।

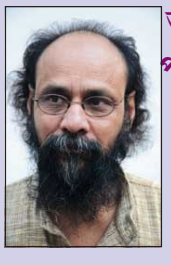

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সম্পর্ক

মনিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু কথা আছে মনে
হেসে বলে দাও,
কিছু অপ্রিয় কথা
হেসে এড়িয়ে যাও,
এমনিতেই তো সমস্যার শেষ নেই,
তাই কিছু সিদ্ধান্ত
সময়ের ওপর ছেড়ে দাও।
এমন না হয়,
কাল যেন
হাসতে পারে এমন কোনো লোকই
খুঁজে না পাওয়া যায় ...
তাই আজই মনের খুশি
উজাড় করে দাও।।

মানিয়ে নিতে শিখতে হবে ...
একটু মানিয়ে নেওয়া
সম্পর্ককে চিরতরে
হারিয়ে ফেলার থেকে
অনেক ভালো।।

হাসতে হাসতে সম্পর্ক গড়তে হবে,
আবার ওই সম্পর্কের জোরে
অভিমান ও করতে জানতে হবে।
প্রিয়জনের চোখের জল
কিভাবে মুছিয়ে দেবে
তাও তোমায় জানতে হবে।

প্রিয়জন ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে
কেন আসবে মান অপমান?
প্রাণ ভোমরার অম্লমধুর গুঞ্জনে
ধুয়ে দাও সম্পর্কের মলিন ব্যস্তবতা।

শুধু প্রিয়জনদের
হৃদয় জুড়ে থাকার
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ...!

বড়দিন ও সান্টা

বড় দিন বা ক্রিসমাস একটি বাৎসরিক খ্রিস্টীয় উৎসব। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়। এই দিনটিই যিশুর প্রকৃত জন্মদিন কিনা, তা জানা যায় না। আদিযুগীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এই তারিখের ঠিক ৯ মাস পূর্বে মেরির গর্ভে প্রবেশ করেন যিশু। সম্ভবত, এই হিসাব অনুসারেই ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যিশুর জন্মতারিখ ধরা হয়।

তবে বাঙালিদের কাছে এই দিনটির পরিচয় বড়দিন হিসেবে। যিশু যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও দর্শন দিয়ে গেছেন, বিশ্বব্যাপী বিশাল অংশের মানুষ তার দেওয়া ধর্ম ও দর্শনের অনুসারী। যিনি এতো বড় ধর্ম ও দর্শন দিলেন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মদিন। সে কারণেই এটিকে বড় দিন হিসেবে বিবেচনা করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ।

বড়দিনের প্রধান আকর্ষণ অন্যতম হলো লাল সাদা পোশাক আর সাদা চুল দাড়ির সান্টা ক্লজ। এই রাতেই বল্গা হরিণে টানা স্লেজে চেপে পুরো দুনিয়া চষে বেড়ান। ঝুলিতে থাকে উপহার। সব শিশুরহাতে সেই উপহার দিয়ে যান সান্টা ক্লজ।

বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ সান্টা ক্লজ আসলে কী, তা জানেন? কীভাবে এলেন এই সাদা দাড়ি লাল টুপির মানুষটি। কেনই বা শিশুদের উপহার দিয়ে বেড়ান। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর ২৮০ বছর পরে রোমের মাইরাতে

জন্ম হয় সেইন্ট নিকোলাসের। এশিয়ার মাইনর বর্তমান তুরস্কের পাতারা নামক অঞ্চলে তার জন্ম। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারান তিনি। তার জীবনের একমাত্র ভরসা ও বিশ্বাস ছিল যিশু খ্রিস্টের ওপর। নিজে ছোটবেলায় অনাথ হয়ে যান। তাই গরিব শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসেন।

তিনি খুবই মহৎ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দান-দক্ষিণায়ও সুনাম ছিল তার। মহানভবতার জন্য তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। তিনি মানবরক্ষক হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, নিকোলাস ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ও মধ্যরাতে ছেলেমেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে উপহার দিতেন। গরিব শিশুদের উপহার দিয়ে বেড়াতেন। আকাশে অর্ধেকটা চাঁদ থাকলে নিজেকে আড়াল করে উপহার দিতেন সেইন্ট নিকোলাস। এতেই নিজের আনন্দ খুঁজে পেতেন। সেই থেকে সান্টা নামেই পরিচিতি পেতে থাকেন নিকোলাস।

কিন্তু নিকোলাস তো লাল পোষাক পরে উপহার দিয়ে বেড়াতেন না। তবে সান্টা ক্লজের পোশাক লাল কেন? এর পেছনেও কারণ রয়েছে। ইতিহাস বলে, নিকোলাসকে দেখা যেত বাদামী এবং আরও অন্য রঙের পোশাকে। এর মধ্যে রয়েছে বেগুনি, সাদা, কালো সহ আরও বেশ কিছু রঙের পোশাকে।

তবে বর্তমান সময়ে যে সান্টাকে দেখা যায় তার চেহারা আর গড়ন তৈরি করেন আমেরিকান কার্টুনিস্ট থমাস নাস্ট। ১৮৮১ সালে তিনিই হারপার উইলকি নামে এক পত্রিকায় লাল রঙের পোশাকে সান্টাকে আঁকেন। সেখানে সান্তা হরিণটানা গাড়িতে চড়ে কাঁধে উপহারভর্তি ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের উপহার দেওয়ার চিত্র ফুটে ওঠে। এরপরই সান্টার পোশাক হয়ে যায় লাল-সাদা। আর ক্রিসমাসের উদযাপনেও এই রং প্রাধান্য পেতে থাকে। থমাস নাস্ট সান্টাকে সবুজ পোশাকেও আঁকেন। তবে লাল-সাদা পোশাকেই সান্টা বেশি জনপ্রিয়তা পায়। সান্টার চেহারাকেও বড় করে আঁকেন থমাস। কারণ নিকোলাসের চেহারা খুব অল্পই দেখা যেত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে চিমনি দিয়ে শিশুদের উপহার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিকোলাসের চেহারা অনেকটাই আড়ালে থাকতো। তাই পরে থমাসের আঁকা সেই সান্টার আদলেই গড়ে ওঠে বর্তমান সময়ের শিশুদের প্রিয় সান্টা ক্লজ।

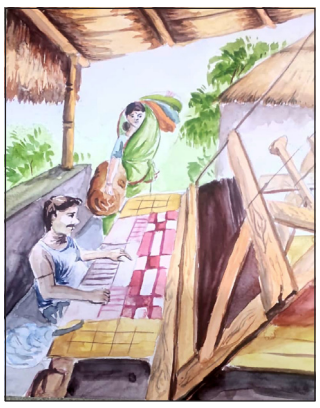

দীপ মজুমদার, শিল্পকলা আর্ট স্কুল

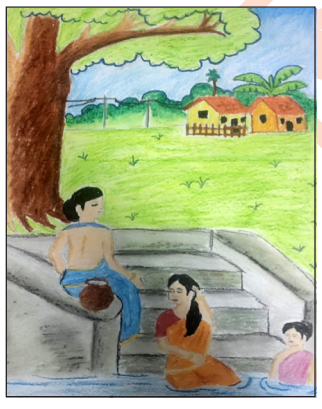

রাজা সাউ, সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নানের মাহাত্ম্য

তুলসী সরকার

পূণ্য স্নানের জন্য মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করেন গঙ্গাসাগরে। হিন্দু ধর্মে মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগরে স্নান ও দান করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে মেলার আয়োজন করা হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ভক্তদের বিশ্বাস, একজন ভক্ত সমস্ত তীর্থে গিয়ে যে পূণ্য ফল পান, তা গঙ্গাসাগরের তীর্থে একবারই পেয়ে যান। এই কারণেই প্রচলিত হয়েছে 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। আর গঙ্গাসাগর মেলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু মেলা। হিন্দু ধর্মে, গঙ্গাসাগরে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের স্নানের গুরুত্ব রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রতেও। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সংক্রান্তিতে সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, মকর সংক্রান্তি শুরু হয় যখন সূর্য দেবতা মকর রাশিতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। সূর্যের এই পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য রয়েছে কারণ মকর হল শনির ঘর এবং শনি এবং সূর্য উভয়েরই একে অপরের প্রতি বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে। শনি হলেন সূর্যদেবের পুত্র। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময়, সূর্য তার ছেলের প্রতি তার রাগ ভুলে যায় এবং একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রসারিত করে। এটিকে একটি শুভ সময় চিহ্নিত করা হয় এবং এর মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে। মকর সংক্রান্তি হল দীর্ঘ শীতের সমাপ্তি। পাশাপাশি এটা নতুন ফসল কাটার সময়। হিন্দু সংস্কৃতি অনুসারে, এটিকে উত্তরণের পবিত্র পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অশুভ সময়ের সমাপ্তি এবং ভাল সময়ের শুরু। এই সময় থেকে রাত ছোট এবং দিন বড় হতে শুরু করে। এটি জ্যোতিষ অনুশীলন এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত আন্দোলনের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত বন্ধন প্রতিফলিত করে।

এছাড়াও গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির দিনে স্নানের পুণ্যের পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে, যে দিন শিবের চুল থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে ঋষি কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছেছিল, সেই দিনটি ছিল মকর সংক্রান্তির দিন। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির একটি মন্দির রয়েছে। কপিল মুনিকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়। কপিল মুনির সময়ে রাজা সাগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞের ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করেন। বিশ্বাস করা হত যে, এই ঘোড়াগুলো কোন রাজ্য থেকে যাবে, সেখানকার রাজাকে সাগর রাজার পরাধীনতা মেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই ঘোড়াকে রক্ষা করতে রাজা সাগর তাঁর ৬০ হাজার পুত্রকেও পাঠিয়েছিলেন।

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, একদিন হঠাৎ ঘোড়া নিখোঁজ হওয়ায় সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। যা পরে কপিলমুনির আশ্রমে পাওয়া যায়। রাজার ছেলেরা সেখানে গিয়ে কপিলমুনিকে কু-কথা বলে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কপিল মুনি তাঁর চোখের তীক্ষ্ণতায় সেই ষাট হাজার পুত্রকে পুড়িয়ে ছাই করে দেন। বহু বছর ধরে রাজা সাগর কপিল মুনির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাননি। সেই সময় রাজার সূর্য বংশের পরবর্তী বংশধর ভগীরথ কপিল মুনির আশ্রমে পৌঁছান এবং সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চান। তিনি পিতৃপুরুষদের মুক্তির জন্য সমাধান চেয়েছিলেন। সেই সময় কপিলমুনি তাঁর গঙ্গার জল থেকে মুক্তির উপায় বলেন। কপিল মুনির মতে, রাজা ভগীরথ কঠিন তপস্যা করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। এরপরই গঙ্গার পবিত্র জলে সাগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের আত্মা মুক্তি লাভ করে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com